আগে ০.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ বা ০.৫ শতাংশ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি অথবা ০.৫ শতাংশ সিউডোমোনাস ফ্লুওরোসেন্স দ্রবণ গাছে ও গোড়ার মাটিতে প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

সেচ : পানপাতার বৃদ্ধি, বরজের উপযুক্ত পরিবেশ বজায় রাখা এবং রোগ-পোকা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রয়োজন ভিত্তিক জলসেচের ব্যবস্থা করা জরুরি। গরমের সময় প্রায় প্রতিদিনই সেচ দিতে হয়। শীতকাল বা অন্য সময়ে অবস্থা অনুযায়ী ৩-৪ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। অতিরিক্ত সেচ বা বর্ষার জন্য যাতে বরজে জল না দাঁড়ায় তা খেয়াল রাখা জরুরি। সেচের জন্য জলের উৎস (পুকুর, ডোবা ইত্যাদি) পরিষ্কার রাখা উচিত।

বরজে মাটি দেওয়া : পুরোনো বরজে কখনই সদ্য কাঁচা মাটি ব্যবহার উচিত নয়। গাছের গোড়ায় ধরানোর মাটি আগে বলা পদ্ধতি অনুসারে শোধন করে ব্যবহার করতে হবে। বরজের ভিতর এবং বাইরের চারপাশ পরিষ্কার ও আগাছা মুক্ত করে রাখতে হবে।

ফসল তোলা ও ফলন : পান লাগানোর সাধারণত ৫-৬ মাস পরে প্রথম পানপাতা তোলা হয়। বাংলা জাতের পানে বছরে গড়ে গাছপ্রতি ৬০-৮০টি পাতা পাওয়া যায়। বরজ নির্মাণের ২-৪ বছরের মধ্যে পাতার সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। পাঁচ কাঠার একটি বরজ থেকে বছরে গড়ে ২-৪ লাখ পানপাতা পাওয়া যায়।

পানের রোগপোকা ও এদের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

বরজের মধ্যে ছায়াঘেরা এবং আর্দ্র আবহাওয়া বিভিন্ন রোগ-সৃষ্টিকারী জীবাণু ও পোকামাকড়ের বিস্তারের পক্ষে সহায়ক হওয়ায় পান সহজে রোগ ও পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয় । পানের প্রধান প্রধান রোগপোকা এবং এদের প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হল।

১। ফাইটোফ্থোরা ছত্রাকঘটিত গোড়াপচা রোগ :

মারাত্মক এই গোড়াপচা বা ঢলে পড়া রোগ মাটি ও আক্রান্ত লতার মাধ্যমে ছড়ায়। এই রোগের আক্রমণে মাটির কাছাকাছি লতার নীচের দিকে গাঁটে ও ডাঁটার (কাণ্ড) উপর কালো দাগ দেখা যায়। বর্ষাকালে কালোদাগটি ডাঁটার চারদিক ঘিরে ফেলে। ফলে ডাঁটা পচে যায় এবং এর পরে পচা আক্রান্ত অংশ ভেজা ভেজা পিচ্ছিল ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়। আক্রান্ত লতাকে সামান্য টান দিলে সহজে মাটির উপরের অংশ থেকে ছিঁড়ে যায়। মাটির নীচের লতার অংশ এবং শিকড় কালো হয়ে পচতে শুরু করে। লতা নামিয়ে দেওয়ার পরও আক্রান্ত অংশ পচতে শুরু করে এবং লতা মরে যায়। বর্ষাকালে বরজ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাটিতে ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হলে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে।

২) পাতাপচা রোগ (ফাইটোফ্থোরা ছত্রাকজনিত) :

গোড়াপচা রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অনেক সময় লতার উপরের অংশে আক্রমণ করে এবং এই একই জীবাণু থেকে পাতাপচা রোগ হয়। পাতার যে কোনো অংশে, বিশেষ করে কিনারার দিক থেকে গোলাকার গাঢ় বাদামি কালো রঙের ভেজা ভেজা পচা দাগ দেখা যায়। খুব তাড়াতাড়ি এই দাগ বেড়ে পাতার অর্ধেক বা তার বেশি জায়গায়

ছড়িয়ে পড়ে, পাতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। কখনো পাতার আক্রান্ত অংশের মাঝে চক্রাকারে ঢেউ খেলানো হালকা রঙের দাগ দেখা যায়। এই রোগটি ফোসকা পড়া বা ঠোসা রোগ নামেও পরিচিত। বর্ষাকালে ভেজা আবহাওয়াতে এই রোগের প্রকোপ বাড়ে এবং গাছের নীচের দিকের পাতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩) স্কেলরোশিয়াম ছত্রাকঘটিত গোড়াপচা (গেন্দি, মেদুয়া, ছাতাপড়া) :

এই রোগে মাটির কাছাকাছি আক্রান্ত গাছের কাণ্ড বা গোড়ার ডাঁটার রঙ কালচে ও ভেজা ভেজা মতো হয়ে পচে মরে যায়। পাতা ঝরে যায় এবং গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত পচা জায়গায় সাদা তুলোর মতো ছত্রাকের আবরণ দেখা যায়। কিছুদিন পর সরষেদানার মতো জীবাণু দেখা যায়। এই রোগ সাধারণত বরজের ভিতর বিভিন্ন জায়গায় ছোট ছোট অংশে দেখা যায়। যে কোনো বয়সের লতায় যে কোনো সময় এই রোগ হতে পারে।

৪) ছত্রাকঘটিত পাতার দাগ রোগ (কোলেটোট্রিকাম্‌জনিত) :

আঙ্গেরী, শ্বেতী, চিত্‌লা প্রভৃতি নামে পরিচিত এই রোগের আক্রমণে পাতার মান ও দাম অনেক কমে যায়। আক্রান্ত পাতায় কালো বা বাদামি রঙের বিভিন্ন আকারের অসংখ্য দাগ দেখা যায়। দাগগুলি একটির সাথে আরেকটি মিশে বড় দাগ হয়। প্রতিটি দাগ ঘিরে থাকে হলুদ রঙের আভা। অনেক সময় পাতার ধারেও এই রোগ দেখা যায়। বিশেষত গরম আর্দ্র আবহাওয়াতে পাতার আক্রমণ বাড়তে বাড়তে কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ডাঁটা ও বোঁটার উপর সরু লম্বা বাদামি দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত জায়গার উপর লতার অংশ শুকিয়ে যায়।

৫) ব্যাকটেরিয়াঘটিত পাতার দাগ রোগ :

এই রোগের লক্ষণ কিছুটা আঙ্গেরী বা চিত্‌লার মতো। প্রথমে পাতায় অসংখ্য কালো রঙের দাগ দেখা যায়। হলদে রঙের দাগে ঘেরা এই কালো দাগগুলি প্রাথমিক অবস্থায় পাতার শিরা-উপশিরার মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পরে একটি দাগের সাথে আর একটি দাগ মিলে বড় দাগ হয়। পাতার উল্টোদিকের হলুদ অংশটি সম্পূর্ণ ভেজা ভেজা হয় (চিত্‌লা রোগের বেলায় পাতার উল্টোদিকের হলুদ অংশটি শুকনো থাকে)। এই রোগটি অনেক সময় গাছের কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়তে পারে। আক্রান্ত কাণ্ডটি কালো ভেজা ভেজা ও আঠালো হয় এবং আক্রান্ত অংশটি ভেঙে যায়।

সুসংহত পদ্ধতিতে পানের রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

পানচাষের অন্যতম সমস্যা এর রোগ। একবার পানগাছে রোগ লাগলে আক্রান্ত গাছ বা পাতাকে আগের নীরোগ অবস্থায় ফেরানো সম্ভব নয়। তাই রোগ যাতে আর না ছড়ায় তা দেখা দরকার। রোগ সৃষ্টিকারী বিভিন্ন জীবাণু যেমন মাটিতে থাকে আবার বীচন, কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচের জল, আগাছা ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায় ও পানগাছকে সংক্রামিত করে।

অনুকূল পরিবেশে অর্থাৎ বর্ষাকালের উষ্ণ স্যাঁতসেঁতে গুমোট আবহাওয়াতে এই সকল জীবাণুর বাড়বাড়ন্ত বেশি দেখা যায়। এছাড়া সময়ে ঠিক পরিচর্যার অভাবে পানগাছ নানা রকম রোগে আক্রান্ত হয়। এই সমস্যা দূর করার জন্য বরজে তৎপরতার সঙ্গে বাছবিচারহীনভাবে বিষাক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়। এতে নিয়ন্ত্রণে না থেকে সমস্যা আরো বেড়ে যায়। পানপাতা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়। তাই কেবলমাত্র বিষাক্ত রাসায়নিক

জীবাণুনাশকের উপর নির্ভর না করে সুসংহত উপায়ে বিভিন্ন ধরনের রোগ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা (পরিচর্যাগত, জৈবিক, রাসায়নিক ইত্যাদি) গ্রহণ করা দরকার।

পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা যেমন মাটিশোধন, রোগ সহনশীল জাতের ব্যবহার, নীরোগ উৎস থেকে ডগায় বীচন সংগ্রহ ওশোধন, শোধন করা আশ্রয় কাঠি, বাঁধন, কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার, বরজের ভিতরে ও বাইরের আগাছা নির্মূল করণ, বরজের অতিরিক্ত সেচের জল ও বৃষ্টির জল নিষ্কাশন, বর্ষাকালে বরজের ছাউনি কিছুটা হালকা করা, সারি বরাবর শোধন করা শুকনো মাটির ব্যবহার এবং জৈব সার - জীবাণুসার এবং ভালোভাবে পচা গোবর সার ও নানা রকম খইল যত্নের সঙ্গে সঠিক সময়ে সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত।

প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বর্ষা শুরু হওয়ার আগে থেকে কমপক্ষে চার মাস পর্যন্ত ১ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ এবং ০.৫ শতাংশ ট্রাইকোডার্মা যথাক্রমে ২০ থেকে ৩০ দিন অন্তর গাছের গোড়ায় এবং ০.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ বা ০.৪ শতাংশ কপার অক্সিক্লোরাইড এবং ০.৫ শতাংশ ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি যথাক্রমে ১৫ দিন অন্তর পাতার উভয়দিকে স্প্রে করা দরকার।

গেন্দি বা মেদুয়া রোগে আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র চারপাশের ১০- ২০ সেমি (প্রায় ৬ ইঞ্চি) মাটি সমেত সম্পূর্ণ গাছটি এবং দুপাশের দু-একটি গাছশিকড় সমেত তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ওই জায়গায় চুন ছড়িয়ে দিলে রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কমে। সরষে খইলের পরিবর্তে বাদাম ও তিসির খইল ১ : ১ অনুপাতে ব্যবহার এবং ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি মিশ্রিত ভালোভাবে পচা গোবর সার ১ :৫০ অনুপাতে প্রয়োগ করলে এই রোগের প্রকোপ কমে।

বোর্দো মিশ্রণ (০.৫ শতাংশ) প্রয়োগ করা ছাড়া ও চিতলা বা আঙ্গেরী রোগে ০.১ শতাংশ বিটারট্যানোল (২৫ শতাংশ জলে গোলা পাউডার) অথবা ০.২৫ শতাংশ ম্যানকোজেব এবং ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতার দাগ রোগ নিম-খইলের ব্যবহার এবং স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন একগ্রাম ১০ লিটার জলে গুলে পাতার দু-দিকে স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় :

১) **সাদা ও কালো মাছি (বগুরা) :** সাদা ও কালো রঙের পূর্ণাঙ্গ মাছি গাছের ডগার দিকের দুই-তিনটি পাতার নীচে ঝাঁক বেঁধে থাকে এবং ডিম পাড়ে। কালো বা হালকা বাদামি রঙের পুত্তলিগুলি পাতার তলায় আটকে থাকা অবস্থায় পাতার রস চুষে যায়। পাতা বিবর্ণ হয়। পাতায় হলদে রঙের ছোপ ছোপ দেখা যায়। পাতার নীচের তলায় পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

২) **জাব পোকা :** সবুজ রঙের ছোট আকারের নরম এই পোকাগুলি পানগাছের কচি ডগা এবং নতুন পাতার উপর ও নীচে ঝাঁক বেঁধে থাকে। ডগা ও পাতার রস চুষে খায়। পাতা কুঁকড়ে যায়, ডগা বাড়তে পারে না। জাব পোকার শরীর থেকে বার হওয়া মিষ্টিরস নীচের পাতার উপর কালো ঝুলের মতো প্রলেপ সৃষ্টি করে। শীতের শেষে এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

৩) **আঁশ পোকা :** মাছের আঁশের মতো দেখতে এই পোকাগুলি গাছের কাণ্ড ও পাতার বোঁটায় চেপটে লেগে থেকে রস চুষে খায়। পূর্ণাঙ্গ পোকার সাথে ডিমের থলি লেগে থাকায় এদের ঢাকনাওয়ালা সাদা চুলের প্রলেপের

মতো দেখায়। শীতকালের আগে এদের আক্রমণ নজরে পড়ে।

৪) **দয়ে পোকা :** দুধসাদা রঙের নরম এই পোকাগুলির আক্রমণে পাতা ও ডগা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। পোকার আক্রমণ খুব বেশি হলে পাতাগুলি শুকিয়ে ঝরে পড়তে পারে। পোকাগুলি মাটির ১৫ সেমি (৬ ইঞ্চি) গভীরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে দু/এক দিন অপূর্ণাঙ্গ পোকাগুলি গোড়ার দিকে ঝাঁক বেঁধে থাকে। পরে কচি ডগায় পৌঁছে ডগা ও পাতায় আটকে থেকে রস চুষে খায়। বর্ষাকালের পর এই পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

৫) **চিরুনি পোকা :** চঞ্চল প্রকৃতির এই পোকার বিভিন্ন দশা পাতা ও গাছের বিভিন্ন নরম অংশ থেকে রস চুষে খায়। আক্রান্ত পাতা ও গাছ ফ্যাকাসে হয়ে শুকিয়ে যায়।

৬) **লালমাকড় :** লালচে ক্ষুদ্র আকারের মাকড় দলবেঁধে থাকে। এরাও পাতার রস চুষে খায়। পাতার উপর তামাটে রঙের ছোপ ছোপ দাগ হয়, পাতা কুঁকড়ে যায়। এছাড়া মাকড়ের আক্রমণ এবং হরমোন ও অনুখাদ্যের অভাবজনিত কারণে পানপাতাতে কালো ছিটে দাগ বা 'ছলমা' দেখা যায়।

৭) **নিমাটোড :** নিমাটোড বা মাটির কৃমির আক্রমণে গাছের শিকড় ফুলে যায়। শিকড়ে বিভিন্ন আকারের গাঁট তৈরি হয়। আক্রমণ বেশি হলে লতা বাড়ে না। গাছের বাড়ন্ত ডগা কালচে হয়ে ঢলে পড়ে। পাতা হলদেটে হয়ে কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। কখনো কখনো শিকড় পচে যায় ও গাছ মরে যায়। বেলে মাটিতে এদের আক্রমণ বেশি হয়।

পোকামাকড় ও নিমাটোড-এর সুসংহত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

পান বরজে পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধে বিষাক্ত কীটনাশকের ব্যবহার কখনোই নিরাপদ নয়। এর বিকল্প হিসাবে সঠিক সময়ে নিমজাত কীটনাশক, নিমতেল (৩ শতাংশ) নিমপাতা ও বীজের নির্যাস এবং তামাক ডাঁটার নির্যাস প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পরিচর্যামূলক ব্যবস্থা হিসাবে পরপর ৪-৫ দিন শুধুমাত্র পরিষ্কার ঠান্ডা জল প্রয়োগ করেও মাকড়ের প্রকোপ কিছুটা কমানো যায়। এছাড়া (১) গাছ থেকে গাছ এবং সারি থেকে সারির মধ্যে সঠিক দূরত্ব রাখা, (২) সারিতে গোড়ার মাটি উঁচু করা, (৩) বর্ষাকালে বরজের বেড়ায় সামান্য ফাঁক রেখে উপযুক্ত আলোবাতাস ঢোকার ব্যবস্থা করা, (৪) প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও জলের ব্যবহার না করা ও পটাশঘটিত সারের ব্যবহার নিশ্চিত করা, (৫) সব সময় বরজ পরিষ্কার ও আগাছামুক্ত রাখা, (৬) আঠালো চটচটে হলুদ ফাঁদের ব্যবহার এবং (৭) উপকারী বন্ধু পোকা ও মাকড়সার সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যে সমস্ত এলাকায় নিমাটোড বা কৃমির উপদ্রব বেশি, সেখানে সরষে খইলের পরিবর্তে বছরে অন্তত দু-বার নিমখইলের ব্যবহার করা উচিত। কাঁচা অথবা শুকনো গাঁদাফুল গাছের পাতা কুচি কুচি করে পানগাছের গোড়ার মাটির সঙ্গে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে নিমাটোডের আক্রমণ কিছুটা ঠেকানো যেতে পারে।

জৈবিক ব্যবস্থা হিসাবে পানের বিভিন্ন শোষক পোকা নিয়ন্ত্রণে ছত্রাকজাত কীটনাশক বিউভেরিয়া ব্যাসিয়ানা (২-৪ মি.লি. প্রতি লিটার জলে) স্প্রে করা নিরাপদ ও কার্যকরী।

এরপর বিশেষ প্রয়োজনে একান্ত বাধ্য হলে কম বিষযুক্ত এবং প্রয়োগের স্বল্পকালের মধ্যে বিয়োজিত হয় বা কার্যকারিতা নষ্ট হয়, এমন নিরাপদ রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে। এই জাতীয় কীটনাশক প্রয়োগের আগে ব্যবহারযোগ্য পাতা বরজ থেকে তুলে নিতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগের অন্তত ১০-১৫ দিন পর্যন্ত বরজ থেকে পান তোলা উচিত নয়।

সারণি-১ পরিবেশ সহায়ক কয়েকটি রাসায়নিক কীটনাশক —

ক্রমিক সংখ্যা	কীটনাশকের নাম	মাত্রা	মন্তব্য
১।	কার্বারিল-৫০ শতাংশ জলে গোলা পাউডার	২.৫ গ্রাম প্রতি লিটার জলে।	স্পর্শজনিত; পান তোলার এক সপ্তাহ আগে ব্যবহার করা যাবে। অন্তর্বাহী;
২।	ইমিডাক্লোপ্রিড ১৭.৫ শতাংশ এস.এল।	১.০ মি.লি. প্রতি ৫.০ মি.লি প্রতি	শোষক পোকা বিশেষত সাদা মাছি, দমনে বিশেষ কার্যকরী। স্পর্শজনিত;
৩।	কার্বোসালফান ২৫ শতাংশ ই.সি	১.০ মি.লি. প্রতি ৫—৭.৫ লিটার জলে	মাকড় ও নিমাটোড নাশকরূপেও কাজ করে।
৪।	অ্যাসিফেট-৭৫ শতাংশ এস.পি.	১.৫ গ্রাম প্রতি ২ লিটার জলে।	অন্তর্বাহী ও স্পর্শজনিত; ব্যবহারের ১০-১৫ দিন পর পান তোলা যাবে।
৫।	ইথিফেনপ্রক্স ১০ শতাংশ ই.সি.	১.০ মি.লি. প্রতি লিটার জলে।	স্পর্শজনিত; নিমাটোড ও মাটির পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

বোর্দো মিশ্রণ ও উদ্ভিদজাত কীটনাশক তৈরির পদ্ধতি

বোর্দো মিশ্রণ তৈরী অবস্থায় কিনতে পাওয়া যায় না। ব্যবহারের আগে এই মিশ্রণ বাড়িতে তৈরি করে নিতে হয়।

ক) **এক শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ :** পাঁচ লিটার জলে ১২০ গ্রাম কলিচুন এবং ৫ লিটার জলে ১০০ গ্রাম তুঁতে আলাদাভাবে মাটির বা প্লাস্টিকের পাত্রে রাতে ভেজানো হয়। পরদিন সকালে ওই চুন ও তুঁতে আলাদাভাবে ছেঁকে ফেলার পর আরেকটি পাত্রে ধীরে ধীরে কাঠের কাঠি দিয়ে নাড়িয়ে ভালোভাবে মেশানো হয়। এই মিশ্রণে একটি ব্লেড ডোবালে যদি ব্লেডের উপর মরচের মতো দাগ পড়ে, তবে আরও কিছু পরিমাণ চুনের দ্রবণ মেশাতে হবে।

খ) **০.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ :** পাঁচ লিটার জলে ৬০ গ্রাম কলিচুন এবং ৫ লিটার জলে ৫০ গ্রাম তুঁতে আলাদা ভাবে পাত্রে মিশিয়ে আগে বলা পদ্ধতি অনুসারে ০.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করা যায়।

সতর্কতা : বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করার সময় (১) চুন ও তুঁতে আলাদা পাত্রে মেশাতে হবে। (২) ধাতব পাত্র বা হাতা ব্যবহার করা চলবে না। (৩) বোর্দো মিশ্রণ তৈরি করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে, ফেলে রাখা চলবে না।

২) **নিমের নির্যাস :** এই নির্যাস নিমগাছের পাতা বা বীজ থেকে তৈরি করা হয়।

ক) নিমের পাতা থেঁতো বা জলে ৩০ মিনিট সেদ্ধ করে এই নির্যাস তৈরী করা যায়। ১০০ গ্রাম কাঁচাপাতা থেকে এইভাবে ৪ লিটার নির্যাস তৈরি করা যায়। বরজে স্প্রে করার আগে প্রতি লিটারে ৫ গ্রাম নরম সাবান মেশাতে হবে।

খ) এক কেজি শুকনো নিমবীজের গুঁড়ো কাপড়ে পুটলি বেঁধে একটি পাত্রে ৫ লিটার জলে প্রায় ১২ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরে নিমবীজ ভেজানো পুঁটলিটা ওই জলে ভালভাবে নিংড়ে নিতে হবে। এই নির্যাসে প্রায় ৩০ গ্রাম নরম সাবান সামান্য জল দিয়ে মেশাতে হবে। এইভাবে প্রাপ্ত নির্যাসকে জল মিশিয়ে ২০ লিটার করে নিতে হবে। এই মিশ্রণ ভালভাবে গুলে নিয়ে স্প্রে করা যাবে।

৩) **তামাকের নির্যাস :** ২৫০ গ্রাম তামাক পাতার বোঁটা বা ডাঁটা ৩০ গ্রাম নরম সাবান-সহ ২ লিটার জলে ভালভাবে ফোটাতে হবে। প্রায় ৩০ মিনিট ফোটানোর পর ঠান্ডা করে ছেঁকে নিতে হবে। যে নির্যাসটি পাওয়া যাবে, সেটি দশ গুণ জলে মিশিয়ে স্প্রে করা যাবে। সাদা ও কালো মাছি, জাবপোকা নিয়ন্ত্রণে এই নির্যাস যথেষ্ট কার্যকরী।

উন্নত মান ও উচ্চসংরক্ষণ ক্ষমতাযুক্ত পানপাতা উৎপাদন করার জন্য যতটা সম্ভব জৈবপদ্ধতিতে পানচাষ করা প্রয়োজন।

রজনীগন্ধা চাষ

রজনীগন্ধা আমাদের পরিচিত অন্যতম অর্থকরী ফুল। প্রায় এক মিটার লম্বা শিষ বা ডাঁটির উপরে অধিকাংশ জায়গা জুড়ে ৩০-৪০টি ছোট ছোট ফুলে ঢাকা কন্দজাত এই ফুল আকর্ষণীয় সুমিষ্ট গন্ধ ও অতুলনীয় শুভ্রতার জন্য বিখ্যাত। কাটা ফুল এবং খুচরো ফুল হিসাবে বহুল ব্যবহার ছাড়াও আতর বা সুগন্ধী শিল্পে এই ফুলের খুব চাহিদা আছে। ফুলদানি বা ফুলের তোড়া সাজাতে কাটা ফুল, বিয়ে এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য গাড়ি, মণ্ডপ, তোরণ ইত্যাদি সাজানোর জন্য নানা ধরনের মালা তৈরি ও পুষ্পসজ্জার কাজে রজনীগন্ধার কাটা ও খুচরো ফুলের ব্যবহার বেড়ে চলেছে। চাহিদা মেটানোর জন্য আমাদের রাজ্য থেকে দেশের বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যে এবং বর্তমানে বিদেশেও এই ফুল রপ্তানি করা হচ্ছে।

আর্দ্র ও মাঝারি তাপমাত্রার (২০°-৩০° সেঃ) : জলবায়ুর খোলামেলা এলাকা এই চাষের জন্য আদর্শ। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আমাদের রাজ্যে বাণিজ্যভিত্তিক রজনীগন্ধা ফুল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা আছে।

চাষ পদ্ধতি :

জমি ও মাটি নির্বাচন : উঁচু বা মাঝারি উঁচু অবস্থানের জলনিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত খোলামেলা সারাদিন আলো পায় এবং ৬-৭ পি. এইচ. মানের ও প্রচুর জৈব পদার্থযুক্ত উর্বর দোআঁশ মাটির জমি রজনীগন্ধা চাষের জন্য উপযুক্ত। ছায়া পড়ে ও জল জমার সম্ভাবনাযুক্ত কোনো জমিতে এই ফুলের চাষ করা চলবে না। রজনীগন্ধার চাষের জন্য নির্বাচিত জমিতে ঠিক আগের শীতের মরশুমে গাঁদাফুলের চাষ করলে মাটির কৃমি/নিমাটোডের সম্ভাব্য আক্রমণ অনেকটা ঠেকানো যাবে।

চাষের সময় : রজনীগন্ধা প্রধানত গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ফুল। ফাল্গুন-চৈত্র মাস কন্দ রোপণের উপযুক্ত সময়। সঠিক আকারের কন্দ রোপণের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে ফুল পাওয়া যায়। অনেক অভিজ্ঞ কৃষক বিয়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠানের দিন আগাম দেখে এই ফুলের চাষ করে থাকেন। সারা বছর ধরে ফুল নিতে হলে ১৫-২০ দিন পরপর আকার অনুযায়ী ভাগ করে কন্দ লাগাতে হবে। একবার কন্দ রোপণ করে তিন বছর পর্যন্ত ফুল পাওয়া যায়।

জাত : পাপড়ির সংখ্যা ও অবস্থানের বৈচিত্র্য অনুযায়ী রজনীগন্ধা ফুলকে একসারি পাপড়িবিশিষ্ট 'সিঙ্গল' দুই-তিন সারি বা স্তর পাপড়িযুক্ত 'সেমি ডাবল', এবং তিন বা তার বেশি সারি পাপড়িবিশিষ্ট 'ডাবল' - এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

সিঙ্গল শ্রেণি ফুলের গন্ধ ও ফলন বেশি হলেও শীতকালে উৎপাদন ক্ষমতা কম। কাটা ও খুচরো ফুল হিসাবে এবং আতর শিল্পে এটি ব্যবহার করা হয়। ডাবল্ শ্রেণির ফুলের গন্ধ কম, নিমাটোডে সহনশীলতা আছে, শীতকালে ভালো ফোটে, কাটা ফুল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

সিঙ্গল শ্রেণি জাতের মধ্যে, কলকাতা সিঙ্গল, কোয়েম্বাটোর সিঙ্গল, মেক্সিকান সিঙ্গল, রজতরেখা (পাতার মাঝখানে সাদা লম্বা দাগ আছে) উল্লেখযোগ্য।

পার্ল, ডোয়ার্ফ পার্ল, কলকাতা ডাবল্ ও স্বর্ণরেখা (পাতার কিনারা বরাবর সোনালি দাগ থাকে) প্রভৃতি ডাবল্ শ্রেণি জাতের নাম করা যায়।

রজনীগন্ধার কিছু উন্নত /উচ্চফলনশীল হাইব্রিড/জাত ও বৈশিষ্ট্য

জাতের নাম	শ্রেণি	শিষের গড় দৈর্ঘ্য (সেমি)	শিষ প্রতি গড় ফুলের সংখ্যা	গড় ফলন (বিঘা প্রতি)	অন্যান্য বৈশিষ্ট্য
শৃঙ্গার	সিঙ্গল	৮০	৪০	২০০০ কেজি	খুচরো ফুলের উপযোগী নিমাটোড প্রতিরোধী।
প্রোজ্জ্বল	সিঙ্গল	৯৫	৫৫	২২২০ কেজি	কুঁড়ি হালকা গোলাপি, খুচরো ফুলের উপযোগী, নিমাটোড প্রতিরোধী।
ফুলে রজনী	সিঙ্গল	৬৫	৫০	২১০০ কেজি	কুঁড়ি লালচে সবুজ, খুচরো ফুলের উপযোগী, তীব্র সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত।
বৈভব	সেমি ডাবল্	৬০	৩০	৩৫০০ শিষ	নিমাটোড সহনশীল, কাটা ফুলের উপযোগী।
সুভাষিণী	ডাবল্	৯০	৫৫	১০৫০০ শিষ	বড় আকারের, কাটা ফুলের উপযোগী।
আরকা	সিঙ্গল	১০০	৬০	২৯০০ কেজি	দীর্ঘ সময় ধরে ফুল পাওয়া যায়, খুচরো ফুলের উপযোগী।

জমি তৈরি : চার/পাঁচবার আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি গভীর চাষ দিয়ে পনেরো দিন রোদ খাওয়ানোর জন্য জমি ফেলে রাখতে হবে। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে চুন প্রয়োগের দরকার হলে প্রথম চাষের একমাস আগে মাটির সঙ্গে সুপারিশমতো চুন মেশাতে হয়। প্রথম চাষের সময় জৈব সার হিসাবে ভালোভাবে পচা গোবর বা খামারজাত সার এবং নিম খোল প্রয়োগ করতে হবে।

এরপর ভালোভাবে আগাছা বেছে আবার চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করা হয়। পরিচর্যার সুবিধার জন্য জমিকে ১.৫ মিটার (৫ফুট) চওড়া এবং ১০ মিটার (৩৩ ফুট) লম্বা কেয়ারিতে ভাগ করা হয়। পরিচর্যার সুবিধার জন্য লম্বালম্বি দুটি কেয়ারির মধ্যে ৬০ সেমি. (২ফুট) চওড়া ফাঁকা জায়গা রাখতে হয়।

বংশ বিস্তার : সাধারণত ২.০ -৩.০ সেমি. (কমবেশি এক ইঞ্চি) ব্যাসের নীরোগ ও সুপরিণত কন্দ বীজ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। কন্দের আকার ছোট হলে ফুল আসতে দেরি হয়। একবিঘা জমির জন্য ২০০ – ২৫০ কেজি (প্রায় ২০,০০০টি) কন্দের দরকার হয়।

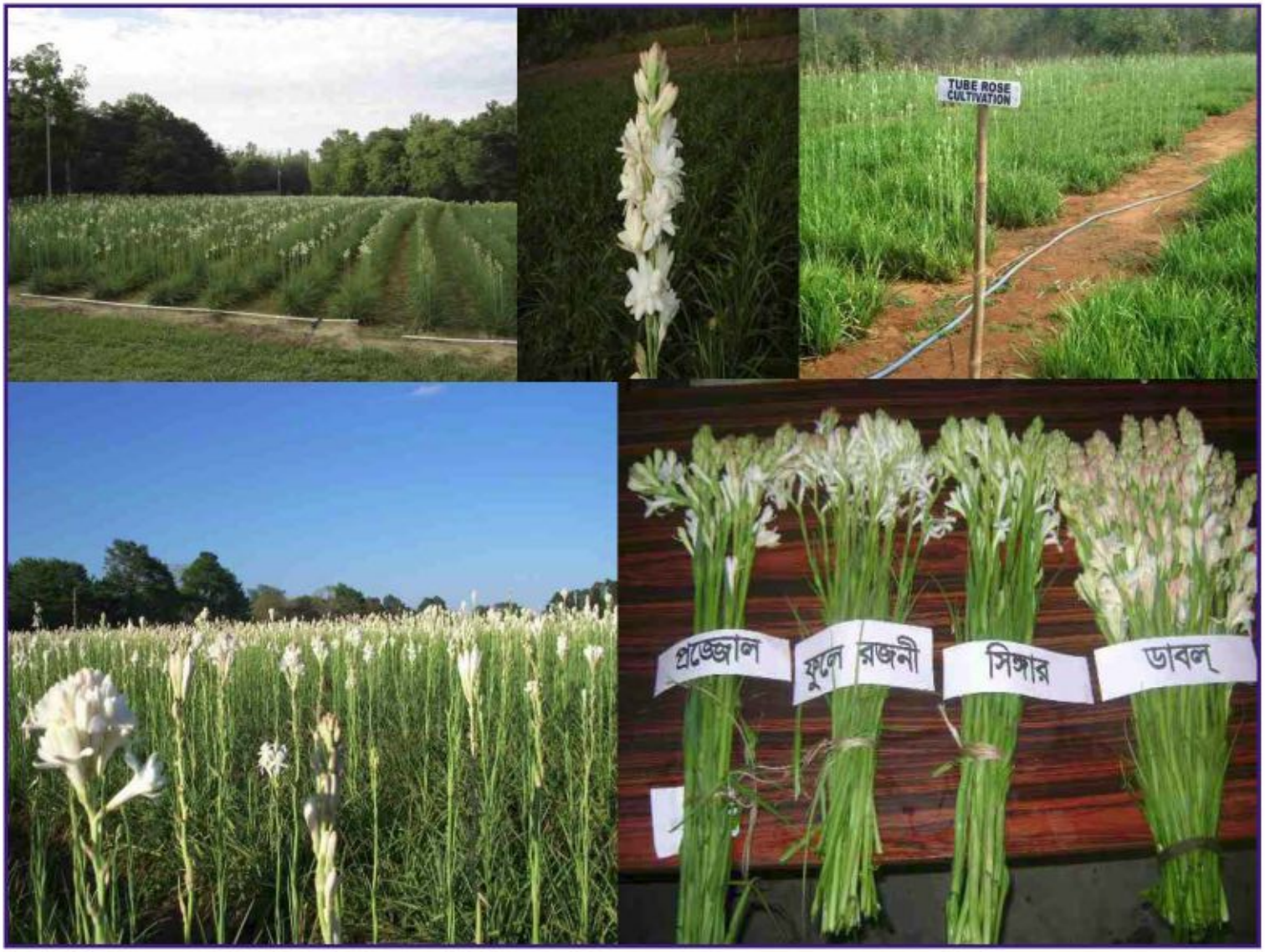
TUBE ROSE
CULTIVATION
প্রজ্জোল
ফুলে রজনী
সিঙ্গার
ডাবল্

কন্দ বাছাই ও কন্দ শোধন : রোপণের আগে নীরোগ, পুষ্ট এবং অক্ষত কন্দগুলি আকার অনুযায়ী ভাগ করে নিতে হয়। সদ্য মাটি থেকে তোলা কন্দের পরিবর্তে কিছুদিন মজুত করে রাখা কন্দ ব্যবহার করলে অঙ্কুর সুষমভাবে বের হয়।

এছাড়া শোধন করার কয়েকদিন আগে কন্দগুলি থায়ো-ইউরিয়ার ০.৪ শতাংশ (৪ গ্রাম/লিটার) জলীয় দ্রবণে কমপক্ষে ৩০ মিনিট ডুবিয়ে রাখলে কন্দের অঙ্কুর তাড়াতাড়ি বের হয় এবং ফুল আগে আসে। কয়েকদিন পরে কার্বেন্ডাজিম্ ৫০ ডব্লিউ পি. ০.২ শতাংশ (২ গ্রাম/লিটার) জলীয় দ্রবণে কন্দগুলি ৩০ মিনিট ধরে ডুবিয়ে রেখে শোধন করার পর ছায়াতে কিছুক্ষণ শুকিয়ে নিতে হয়। এছাড়া নিমাটোড প্রতিরোধের জন্য সারারাত জলে কন্দ ভিজিয়ে রাখার পর কোনো কৃমিনাশক (০.২ শতাংশ মনক্রোটোফস)-এর জলীয় দ্রবণে একটানা ছয় ঘন্টা ডুবিয়ে রেখে কন্দ শোধন করতে হবে।

কন্দ রোপণ : কন্দের আকারের উপর নির্ভর করে সারি থেকে সারি ২০-৩০ সে.মি. (৮-১২ ইঞ্চি) দূরত্ব রেখে প্রতি সারিতে ২০ সে.মি. (৮ ইঞ্চি) পরপর এবং ৪-৫ সে.মি. (২ ইঞ্চি) গভীরতায় কন্দের মুখে উপর দিকে মাটির সঙ্গে সমতলে রেখে রোপণ করতে হবে। রোপণের গভীরতা কম হলে গাছের সংখ্যা বাড়ে, কিন্তু ফুলের মান ও ফলন কমে যায়।

সার ও সার প্রয়োগ পদ্ধতি : প্রথম চাষের সময় বিঘাপ্রতি ৫ টন ভালোভাবে পচা গোবর বা খামারজাত সার বা ৩ টন কেঁচো সার এবং ১৫০ কেজি নিমখইল প্রয়োগ করতে হবে। প্রাথমিক সার হিসাবে বিঘাপ্রতি ৮ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ১৮ কেজি ইউরিয়া), ২০ কেজি ফসফরাস (১২৫ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট) ও ৩৫ কেজি হাড়গুঁড়ো সার এবং ৯ কেজি পটাশ (১৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) ঘটিত সার, শেষ চাষের সময় কেয়ারিতে প্রয়োগ করা হয়। মাটি পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে সর্বদা সার প্রয়োগ করা উচিত।

চাপান সার প্রয়োগ : রোপণের দুই মাস পর থেকে দু-মাস অন্তর দু-বার চাপান সার প্রয়োগ করতে হবে। চাপান সার হিসাবে প্রতি বারে ৪ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ৯ কেজি ইউরিয়া) এবং ৪.৫০ কেজি পটাশ (৭.৫০ কেজি সার হিসাবে প্রতি বারে ৪ কেজি নাইট্রোজেন (প্রায় ৯ কেজি ইউরিয়া) এবং ৪.৫০ কেজি পটাশ (৭.৫০ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ) সার প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া চাষের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বছরে প্রথম বছরের মতো নিমখইল ও রাসায়নিক সার (মূল সার ও চাপান) প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া গাছে ফুল আসার সময় জৈব তরল সার এবং এক শতাংশ (১০ গ্রাম প্রতি লিটার জলে) পটাশিয়াম নাইট্রেট প্রয়োগ বেশ কার্যকরী।

জীবাণু সার প্রয়োগ : রাসায়নিক সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পর প্রতি বিঘা জমির জন্য ১২০০ গ্রাম অ্যাজাটোব্যাক্টর ও ফসফেট দ্রাবক জীবাণুর সংমিশ্রণ প্রয়োজনমতো বা ৮-১০ কেজি ছাই বা ভালোভাবে পচা গোবর সার বা কেঁচো সারের সঙ্গে মিশিয়ে বিকালবেলায় সারি বরাবর প্রয়োগ করতে হবে।

এছাড়া প্রতিবার চাপান সার প্রয়োগের ৬-৭ দিন পরে ৪০০ গ্রাম জীবাণুসার মিশ্রণ আগে বলা পদ্ধতি অনুসারে অথবা জলে মিশিয়ে বিকালবেলায় স্প্রে করা যাবে। জীবাণুসার ব্যবহার করা রাসায়নিক নাইট্রোজেন ও

ফসফরাসঘটিত সার প্রয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩০ শতাংশ কমানো যায় এবং এই ফসল চাষে রোগের প্রকোপ কম হয়।

অনুখাদ্য ও জৈব নিয়ন্ত্রকের ব্যবহার : রজনীগন্ধা ফুলের গুণগত উৎকর্ষতা বাড়ানোর জন্য অনুখাদ্য ও জৈব নিয়ন্ত্রক (এনট্রায়াকন্টানল) কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। এই জন্য ফাইটোনল এম.আই. (ক্লোরিকালচার) সঠিক মাত্রায় (এক মিলি প্রতি ৫ লিটার জলে) কন্দ রোপণের পর ২৫-৩০ দিন অন্তর দুবার (সকালে বা বিকালে) স্প্রে করা হয়। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী বোরন ব্যবহার করতে হয়।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

জলসেচ ও জলনিকাশি ব্যবস্থাপনা : কন্দ রোপণের পরেই একটি হালকা সেচ দিতে হবে। গাছ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জলের চাহিদা বাড়ে। মাটি, আবহাওয়া ও গাছের অবস্থা অনুসারে জলসেচ দিতে হয়। সাধারণত গরমের সময় ৯-১০ দিন অন্তর এবং শীতকালে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া হয়। অনুসেচ ব্যবস্থার বিন্দু বিন্দু (ড্রিপ) সেচ দিয়ে ৫০ শতাংশ জলের খরচ বাচানো যায়। হঠাৎ বেশি বৃষ্টি হলে দ্রুত জল নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন : কন্দ রোপণের ১০/১২ দিন পর চারা গজিয়ে যায় এবং গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়তে থাকে। এই সময় বার বার নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত করে পরিষ্কার রাখতে হবে। চাপান সার প্রয়োগের আগেও প্রতিবার সেচ দেওয়ার পর জমির আগাছা বাছাই ও প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় হালকা মাটি দিতে হয়।

আচ্ছাদনের ব্যবহার : খড়, শুকনো পাতা বা কালো পলিথিন প্রভৃতি আচ্ছাদন হিসাবে ব্যবহার করলে আগাছা দমন করা সহজ হয়। ফুলের মান ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

ফুল তোলা : কন্দের আকার অনুযায়ী সাধারণত রোপণের ৭০-৮০ দিন পরে ফুল ফোটা শুরু হয়। কাটাফুল হিসাবে ব্যবহারের জন্য ডাঁটির নিচের প্রথম দুটি ফুল ফুটতে শুরু করলে শিষের গোড়ার ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) রেখে ধারালো ছুরি দিয়ে কেটে ফুলসহ ডাঁটির বা শিষ কেটে নেওয়া হয়। কুচো ফুলের জন্য ফোটার একদিন আগে ফুলের কুঁড়ি শিষসহ বা আলাদা করে তোলা হয়। সকালবেলায় বা শেষ বিকালে ফুল তোলা উচিত। এর ঠিক পরে বালতিতে জলের মধ্যে ডাঁটির গোড়া ডুবিয়ে রাখতে হবে। গোছাগুলি টিস্যু বা বাদামি কাগজে মুড়ে মোটা কাগজ/ঢেউ খেলানো বোর্ড দিয়ে তৈরি বাক্সের মধ্যে শিষের মাথা ও গোড়ার দিক পরপর বিপরীতভাবে রেখে মোড়কিকরণ করা হয়।

ফলন : রোপণের পর রজনীগন্ধা তিন বছর পর্যন্ত ভালো ফলন দেয়। বৈশাখ থেকে ভাদ্র/আশ্বিন মাস পর্যন্ত ভালো ও বেশি ফুল পাওয়া যায়। শীতকালে ফুলের পরিমাণ কমে যায়। দ্বিতীয় বছর উঁচু মানের ও বেশি ফলন পাওয়া যায়। তৃতীয় বছরে ফুলের উৎপাদন কমে যায়। রজনীগন্ধা কুচো বা খুচরো ফুলের বিঘাপ্রতি গড় ফলন প্রথম বছরে ১০ কুইন্টাল, দ্বিতীয় বছরে ১২-১৫ কুইন্টাল এবং তৃতীয় বছরে ৭-৮ কুইন্টাল হয়।

প্রতিবিঘায় ডাবল্ শ্রেণি কাটা ফুলের ফলন প্রথম বছরে ১০,০০০-১২,০০০টি শিষ এবং দ্বিতীয় বছরে এই জমি থেকে ১৫,০০০-২০,০০০টি এবং তৃতীয় বছরে ৬,০০০-৮,০০০ টি ফুলের শিষ উৎপন্ন হয়।

কন্দ তোলা ও ফলন : চাষের তৃতীয় বছরের শেষে গাছের বাড়বৃদ্ধি থেমে গেলে ও পাতা শুকিয়ে যেতে থাকলে পাতা কেটে এবং জমির মাটি শুকিয়ে নিয়ে কন্দ তোলা হয়। একবিঘা জমি থেকে ২০-২৫ কুইন্টাল কন্দ পাওয়া যায়। কন্দগুলি জমি থেকে তুলে পরিষ্কার করার পর ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করে নিয়ে ঠান্ডা ও ছায়াযুক্ত খোলামেলা ঘরে সংরক্ষণ করতে হয়।

রোগপোকা ও শস্য রক্ষা পদ্ধতি

রোগ

রজনীগন্ধার বিভিন্ন রোগের মধ্যে গোড়া বা কন্দ পচা, কুঁড়ি পচা ও পাতা ধসা মারাত্মক।

(ক) **কাণ্ড/ গোড়া পচা রোগ :** ছত্রাকঘটিত এই রোগটি বর্ষাকালে বেশি দেখা যায়। রোগাক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে থলথলে হয়ে নেতিয়ে পড়ে এবং হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। আক্রান্ত গাছের শিকড় ও কন্দে গাঢ় বাদামি দাগ হয় এবং পচে যায়।

(খ) **কুঁড়ি পচা :** ব্যাকটেরিয়াঘটিত এই রোগ আক্রান্ত ফুলের কুঁড়িতে বাদামি রঙের ঝলসানো দাগ দেখা দেয়। পরে এই কুঁড়িগুলি কুঁচকে শুকিয়ে যায়।

(গ) **পাতা ও ফুল ধসা :** ছত্রাকঘটিত এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফুলের কালচে বাদামি দাগ হয়, শিষ ঢলে পড়ে এবং গাছ ক্রমশ শুকিয়ে যায়।

ফসফরাসের অভাব হলে গাছের উপরের পাতা গাঢ় সবুজ এবং নীচের পাতা বাদামি এবং কখনো ফুল সহজে ঝরে যায়। ক্যালাসিয়ামের অভাবে শিষ ফাটা এবং কুঁড়িপচা রোগের লক্ষণ দেখা যায়। পাতার শিরার মাঝ বরাবর হলদে হয় এবং সহজে ফুল ঝরে যায়।

কীটশত্রু :

রজনীগন্ধার বিভিন্ন কীটশত্রুর মধ্যে শুঁয়োযুক্ত ও শুঁয়োহীন লেদাপোকা, ঘাস ফড়িং, কেড়ি পোকা, কুঁড়ি ছিদ্রকারী পোকা, চিরুনি পোকা, জাব পোকা, লাল মাকড় এবং নিমাটোড বেশি দেখা যায়।

শুঁয়োযুক্ত বা শুঁয়োহীন লেদা পোকা, ঘাসফড়িং গাছের কচিপাতা ও ফুলের কুঁড়ি খায়।

কুঁড়ি ছিদ্রকারী পোকা : বাড়ন্ত ফুলের শিষের ভিতর এই পোকা ডিম পাড়ে। এদের ছোট ছোট লেদা, কুঁড়ি ও ফুলের ভিতর ঢুকে ছিদ্র করে কুরে খায়। ফুল নষ্ট হয়ে যায়।

জাব পোকা : সবুজ রঙের জাব পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে কচিপাতা, ফুলের শিষ থেকে রস চুষে খায়। আক্রান্ত ফুল ঝরে পড়ে ও শিষ শুকিয়ে নুইয়ে পড়ে।

থ্রিপ্‌স : অতিক্ষুদ্র আকারের সদা চঞ্চল থ্রিপ্‌স বা চিরুনি পোকায় আক্রান্ত হলে রজনীগন্ধার মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই পোকার পূর্ণাঙ্গ ও অপূর্ণাঙ্গ দশা পাতা, ফুল ও শিষের রস চুষে খায় এবং গাছ সম্পূর্ণ নষ্ট হয় ও গাছ বসে যায়। কখনও সংক্রামক 'গুচ্ছমাথা' রোগের লক্ষণ দেখা যায়। ফুলের শিষ বিকৃত হয়ে যায়।

কেড়ি পোকা : ছাই রঙের ধাড়ি (পূর্ণাঙ্গ) কেড়ি পোকা রাত্রিবেলায় শিকড় ও কন্দকে আক্রমণ করে। শিকড় কেটে খায়, কন্দের ভিতর বড় গর্ত করে। বিশেষত এই পোকা পাতার কিনারা বরাবর কেটে খায়, পাতার ধার করাতের মতো কাটা কাটা হয়। গাছের খুব ক্ষতি হয়।

লাল মাকড় : পাতার তলায় বসবাসকারী লাল মাকড় পাতার রস চুষে খায়। পাতা কুঁকড়ে যায় এবং পাতায় হলদে রঙের লম্বা দাগ দেখা যায়।

নিমাটোড : মাটিতে বসবাসকারী ও কন্দবাহিত অতিক্ষুদ্র কৃমি বা নিমাটোড রজনীগন্ধা ফুল চাষে ভয়ঙ্কর সমস্যার সৃষ্টি করে। বেশ কয়েক ধরনের নিমাটোডের যৌথ আক্রমণে প্রথমে পাতায় ছোপ ছোপ দাগ হয়, পাতায় লম্বাটে তেলচিটে দাগ, বেঁটে কোঁকড়ানো পাতা, পরে পাতা হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। এছাড়া ফুলের বাঁকা ও কাঁটা কাঁটা শিষ, ঘন হলুদ থেকে বাদামি রঙের পাপড়ি, গাছের বৃদ্ধি না হওয়া, গাছ বসে যাওয়া, নিমাটোড সংক্রমণের অন্যতম লক্ষণ।

প্রধানত আক্রান্ত কন্দের মাধ্যমে নিমাটোডের সংক্রমণ হয়। আক্রান্ত কন্দের গাছে শুকনো শল্ক পত্র বা খোসার খাঁজের ভিতর অসংখ্য কৃমি ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। আক্রান্ত ফুলের ভিতরেও অসংখ্য কৃমি কুণ্ডলী/জট পাকিয়ে থাকে। সেচের জলের মাধ্যমে এই কৃমিগুলি দ্রুত পাশাপাশি জমিতে ছড়িয়ে পড়ে।

সুসংহত পদ্ধতিতে রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা :

অন্যান্য ফসলের মতো রজনীগন্ধারও রোগ ও কীটশত্রু নিয়ন্ত্রণের জন্য সুসংহতভাবে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা দরকার, কেবলমাত্র বিষাক্ত রাসায়নিক কীট/রোগ নাশক ব্যবহার করা উচিত নয়।

পরিচর্যাগত ব্যবস্থাপনা যেমন উঁচু ও জলনিকাশের সুব্যবস্থাযুক্ত জমি নির্বাচন, রোগ/পোকা সহনশীল জাতের ব্যবহার, রোপণের আগে জমিকে রোদ খাওয়ানো, নীরোগ উৎস থেকে বীজ, কন্দ সংগ্রহ ও কন্দ শোধন, আগাছা নিয়ন্ত্রণ, ধানের জমি থেকে জল ঢোকা বন্ধ করা, প্রয়োজনমতো সেচ এবং সেচের অতিরিক্ত জল নিষ্কাশন, আচ্ছাদনের ব্যবহার, অন্তরচাষ, সুষম সার অর্থাৎ অতিরিক্ত নাইট্রোজেনঘটিত সারের ব্যবহার না করা ও ফসফরাস, পটাশ ও অনুখাদ্য সারের ব্যবহার সুনিশ্চিত করা , জৈবসার, জীবাণুসার, কেঁচো সার এবং নিমখইল ভালোভাবে পচা গোবর সারের ব্যবহার প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসাবে কন্দ শোধন করা ছাড়াও বর্ষাকালে ৩-৪ সপ্তাহ অন্তর পর্যায়ক্রমে ০.৫ শতাংশ (৫ গ্রাম/লিটার) জলে ট্রাইকোডার্মা ভিরিডি বা সিউডোমোনাস ফ্লুওরেসেন্স এবং ০.৫ শতাংশ বোর্দো মিশ্রণ গাছের গোড়ায় সারি বরাবর ব্যবহার করে কাণ্ডপচা এবং পাতা/ফুল ধসা রোগের আক্রমণ ঠেকানো যায়।

এতে কাজ না হলে ০.১ শতাংশ কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানকোজেবের মিশ্রণ গাছে স্প্রে করা যাবে অথবা ০.২৫ শতাংশ মেটাল্যাক্সিল এবং ম্যানকোজেবের মিশ্রণ দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি সারি বরাবর ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।